সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন ও একুশ নির্মাণ

মো. মফিজুর রহমান
মোছা. নাসরিন আক্তার

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookMafiz

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণদান ইতিহাসে খুব বেশি ঘটেনি। মূলত ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেই বাংলাদেশের উদ্ভবের বীজ নিহিত বলে ইতিহাসবেত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও অর্জন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গণমাধ্যম বিভিন্ন আধেয়ের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত করে। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ভাবগত ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও সংবাদপত্র জাতিরাষ্ট্রের উপস্থাপন বিশেষত বাংলা ভাষার গুরুত্ব, মাতৃভাষার অধিকার অর্জনে প্রদত্ত মূল্য, সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রচলনসহ ভাষাভিত্তিক মূল্যবোধ, চেতনা ও ঐতিহ্যের তথ্যপ্রবাহে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। নানামুখী তৎপরতার ফলস্বরূপ আমাদের ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বিশ্বসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে 'ভাষা দিবস' একুশকে ঘিরে দেশের সংবাদপত্রগুলোতে উৎসবের আমেজ তৈরির প্রবণতা দেখা যায়। পত্রিকায় এ দিবসকে ঘিরে বিভিন্ন পাঠকের জন্য লাইফস্টাইল পাতার আধেয়তে দেখা যায় কেমন পোশাক পরবে, কেমন খাবারের রান্না হবে, কোন রেস্তোরাঁয় কেমন অফার ইত্যাদি এবং সেইসাথে দেখা যায় বিভিন্ন ফ্যাশন-ব্যান্ডের পোশাকের বিজ্ঞাপন। বর্তমান প্রবন্ধে সংবাদপত্রে একুশ নির্মাণের বিবর্তন অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমাজে গণযোগাযোগের কাজ, গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পণ্য-সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যম ও ভোগবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণ করে সংবাদপত্রে একুশ নির্মাণ পর্যালোচনা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল– পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম-পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)। ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার দিক থেকে এ দুই অংশের মধ্যে ছিল বিস্তর তফাত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা উর্দুকে পুরো পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ; যাদের মাতৃভাষা প্রধানত বাংলা, তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের

ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি তোলেন। তবে তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে পরিষদে উপস্থিত মুসলিম লীগের সকল মুসলিম সদস্য একযোগে এ দাবির বিরোধিতা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্যও দেন। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা সফরে এসে এক সমাবেশে ঘোষণা করে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে।

আন্দোলন আরো জোরালো হয় ১৯৫২ সালে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এসে ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি জিন্নাহ্'র ঘোষণার পুনরুক্তি করে বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু"। তার এই বক্তব্যর প্রতিবাদে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদ-সভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ' গঠিত হয়। পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। সমাবেশ থেকে আরবি লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাবের প্রতিবাদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ঢাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে। কিন্তু পাকিস্তানি পুলিশ সেই মিছিলের উপর গুলি চালায় এবং এতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকে নিহত হন। এ রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর সারা পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বুনে দিয়েছিল। ফলে বলা চলে, এটা তাদের জাতীয় অস্তিত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বাঙালির জাতীয় চেতনা ও মর্যাদার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি পরবর্তীকালে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায়। ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্য ও মহিমা ধারণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিবর্তন লক্ষ করা গেছে। এ বিবর্তনের স্বরূপ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে। কারণ, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য-পর্যালোচনার পর দেখা গেছে, এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম এবং লেখালেখি খুবই অপ্রতুল। সেই শূন্যতা বর্তমান অনুসন্ধানের মাধ্যমে পূরণের চেষ্টা করা হবে। গবেষণাটি ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে এবং কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

গবেষণার প্রশ্ন

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোতে ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনা উপস্থাপনের বিবর্তন হয়েছে কি না, তা মূল অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল প্রশ্নকে আরো কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্নে ভাগ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গবেষণা প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

- ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা কী ছিল?
- একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা এবং এর মহিমা সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকাগুলোতে কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে?
- ভাষা আন্দোলন এবং একুশের চেতনাকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা দেখা যায় কি না?

তাত্ত্বিক কাঠামো

বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে সমাজে গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা, গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পণ্য সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যম ও ভোগবাদ তত্ত্বগুলো অনুসরণ করে 'সংবাদপত্রে একুশ নির্মাণ' পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তত্ত্বগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং কীভাবে তত্ত্বগুলো ব্যবহার করা হবে তা আলোচনা করা হলো।

সমাজে গণ-যোগাযোগের কাজ

১৯৪৭ সালে হাচিনস কমিশন (Hutchins Commission) গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্বটি প্রস্তাব করে। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো গণমাধ্যম কোনো ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং সেন্সরশিপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করবে, তবে একই সাথে সমাজের মঙ্গলার্থে দায়িত্বশীলতার ব্যাপারটাও বজায় রাখতে হবে। গণমাধ্যম কেবল ব্যবসায়িক লাভের জন্য নয় বরং সমাজের উন্নয়নে কাজ করবে দায়িত্বশীলতার সাথে (হাচিন্স, ১৯৪৭)। সীবার্ট এবং অন্যান্যদের মতে, গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ থাকতে হবে, সংবাদ ও তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে (সীবার্ট ও অন্যান্য, ১৯৫৬)। ড্যানিস ম্যাককুইলের মতে, গণমাধ্যমের কাজ হচ্ছে জনমত গঠন, শিক্ষা প্রদান, এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বৃহত্তর স্বার্থে সমাধানের জন্য তুলে ধরা (ম্যাককুইল, ২০১০)। ম্যাককুইল আরো বলেছেন, গণমাধ্যমের একটি প্রধান ভূমিকা হলো সামাজিক উত্তরাধিকার তৈরি করা (ম্যাককুইল, ২০১০)। অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্থানান্তর ঘটানো। হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল তাঁর যোগাযোগ-তত্ত্বে সামাজিক ঐতিহ্যের ট্রান্সমিশন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক ঐতিহ্য হলো সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, প্রতীক এবং আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত হয় এবং এ দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম (ল্যাসওয়েল, ১৯৪৮)।

পণ্য-সংস্কৃতি

পণ্য-সংস্কৃতি বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে বস্তু, বিষয়, জীব কিংবা মানবীয় উপাদান যেমন মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রথা, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদিকে পণ্যে রূপান্তর করা হয়। পণ্য-সংস্কৃতির

ধারণাটি মার্কসবাদী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপন শিল্পে বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল হচ্ছে মানবীয় বিষয়গুলোকে পণ্যের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে পণ্যকে প্রাণ দিয়ে পণ্যের বিক্রি নিশ্চিত করা। যেটাকে কার্ল মার্কস 'কমোডিটি ফেটিশিজম' বলেছেন। পণ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে মস্কো (১৯৯৬) বলেছেন, পণ্যায়ন তখনই ঘটে যখন তথ্য, বিষয়বস্তু, এমনকি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনও পণ্য হিসেবে রূপান্তরিত হয়, যা বিক্রি এবং কেনা যেতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গণমাধ্যম সবকিছুকেই পণ্যে রূপান্তর করে, যার মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। এর ফলে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মতো বিষয়গুলোও বাদ যায় না। হোসকিন্স ও ম্যাকফেডেন (২০০০) উল্লেখ করেন, গণমাধ্যমে সবকিছুই প্রদর্শিত হয় একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা বিক্রির উদ্দেশ্যে। একইভাবে, শিলার (১৯৮৯) বলেন, গণমাধ্যম কেবল বিনোদন বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যম নয়, এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ, যা সবকিছুকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। ইতিহাস ও সংস্কৃতির পণ্যায়ন সম্পর্কে হোমি কে. ভাভা (১৯৯৪) বলেন, গণমাধ্যমে ইতিহাস ও সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়, যা প্রায়শই পুঁজিবাদী স্বার্থে প্রভাবিত হয়।

গণমাধ্যমের ভোগবাদ তত্ত্ব

ভোগবাদ হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পণ্য ও পরিষেবার অধিগ্রহণকে উৎসাহিত করে। এ ধরনের ব্যবস্থায় ভোগ্যপণ্য এবং বস্তুগত সম্পদ অর্জনের উপরই সমাজে মানুষের মর্যাদা, সম্মান, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, কিংবা সংস্কৃতির অন্য বিষয়গুলো নির্ভর করে। থিওডর অ্যাডর্নো এবং ম্যাক্স হর্কহাইমার তাদের *Dialectic of Enlightenment* গ্রন্থে গণমাধ্যমের সাহায্যে কীভাবে সমাজে ভোগবাদী সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, তা আলোচনা করেন। তাঁরা 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'র ধারণা দেন। তাঁদের মতে, গণমাধ্যম মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভোগবাদের মাধ্যমে একটি সমাজ তৈরি করে, যেখানে ভোক্তা হিসেবে মানুষের পরিচয় গড়ে ওঠে।

ফরাসি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক গাই ডেবর্ড 'The Society of the Spectacle'-এর কথা বলেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন একটি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন, যেখানে মানুষ সরাসরি অভিজ্ঞতার বদলে বরং ছবি, চিত্র এবং রেপ্রিজেন্টেশনের মাধ্যমে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে। গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতি এই স্পেক্ট্যাকল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ডেবর্ড (১৯৯৫) মনে করেন, সমাজে মানুষের জীবনধারা ও সামাজিক সম্পর্ক গণমাধ্যমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং মানুষ ক্রমাগত ভোগবাদী মানসিকতার দিকে ঝোঁকে।

গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি

গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো এমন একটি তত্ত্ব যা গণমাধ্যমের মালিকানার সাথে গণমাধ্যমের প্রচারিত বার্তা বা আধেয়ের সম্পর্ক খোঁজে। বলা হয়, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান শুধুই মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য রাখে না, একইসাথে অন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকে। অর্থাৎ গণমাধ্যম কেবল তথ্য সরবরাহকারী নয় বরং একটি ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও।

হার্বার্ট শিলার (১৯৮৯) বলেন, "গণমাধ্যমের ওপর কর্পোরেট সংস্থার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তারাই মিডিয়ার আধেয়ের মাধ্যমে কর্পোরেট শক্তির অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে সামনে এগিয়ে দেয়।"

হ্যাবারমাস (১৯৮৯) গণমাধ্যমকে 'পাবলিক স্ফিয়ার'-এর ধারণার সাথে যুক্ত করেন; যেখানে তিনি বলেন, গণমাধ্যম আসলে জনগণের রাজনৈতিক বিতর্কের জায়গা হওয়ার পরিবর্তে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে গণমাধ্যমে প্রচারিত বার্তাগুলো স্বাধীন মত প্রকাশের পরিবর্তে কর্পোরেট এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুগামী হয়ে পড়ে। হারম্যান এবং চমস্কির 'Propaganda Model' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্বের বিকাশে। তাঁদের মতে, গণমাধ্যম কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রভাবিত হয়ে কাজ করে এবং তাদের অনুকূলে সাধারণ জনগণের মতামত নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

গবেষণা-পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য পাঠ-পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিয়্যু) এবং আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠ-পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণা ও দ্বৈতীয়িক তথ্য সংগ্রহের কাজে, আর আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তথ্য-উপাত্ত বা আধেয়ের গুণগত বিশ্লেষণে। গবেষণার জন্য নমুনায়ন পদ্ধতি হিসেবে দৈবচয়ন পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় পত্রিকা থেকেই দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের জন্য আধেয় সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা-তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে গবেষণার এ অংশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ১. ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সংবাদমাধ্যমে তার উপস্থাপন; ২. ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন এবং ৩. বর্তমান সময়ের সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন। তিন অংশের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো:

১) ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সংবাদপত্রে তার উপস্থাপন

গণমাধ্যম বিভিন্নভাবে ভাষা আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণকে আন্দোলনের প্রতি সচেতন ও উৎসাহিত করতে সহায়তা করেছে। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরপরই। ওইসময় থেকে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হলেও বাঙালি লেখক ও সাংবাদিকগণ ভাষার বিষয়ে জোর তৎপরতা চালান ১৯৪৭-এর জুলাই থেকে (জাহান, ২০০৮)। সংবাদপত্রগুলো নিয়মিতভাবে আন্দোলনের খবর প্রচার করতো এবং এভাবে জনসাধারণ নিয়মিত তথ্য পেত। বিশেষ করে *দৈনিক আজাদ*, *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংগ্রাম*, *দৈনিক ইত্তেহাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, এবং *সাপ্তাহিক সৈনিক*সহ আরো অনেক পত্রিকা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে (জাহান, ২০০৮)। পত্রিকাগুলো আন্দোলনের সময়ে সংঘটিত ঘটনা, যেমন মিছিল, প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট, পুলিশের গুলিবর্ষণ ইত্যাদির সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতো। উদাহরণ হিসেবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*'র কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে

ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিয়ে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*'র প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম ছিল, 'দেশের কাছে লাল ফেব্রুয়ারীর শহীদদের ডাক আসিয়াছে', 'বাংলা ভাষা সংগ্রামকে সফল করিয়া রক্তের প্রতিশোধ নাও', 'নুরুল আমিনও প্রতিশ্রুতির পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে', 'জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন সরকার আজ মিলিটারির জোরে বাঁচিয়া আছে' (রহমান, ২০১৭)।

ইত্তেফাক
THE ITTEFAK
সংগঠন শক্তি ও সফলতাই ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ডাক
রাজধানীর রাজপথে সমগ্র প্রদেশের রক্তকঠোর শপথ ঘোষিত

চিত্র: ১

ইত্তেফাক
THE ITTEFAK
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে জনগণ শেষ রক্তবিন্দু দিবে
শহীদদের অকৃত্রিম আদর্শ পূর্ব-পাকিস্তানীরা কখনও ভুলিবেনা

চিত্র: ২

দৈনিক আজাদ'র কথাও উল্লেখ করা যায়। পত্রিকাটি 'মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলিবর্ষণ', 'পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

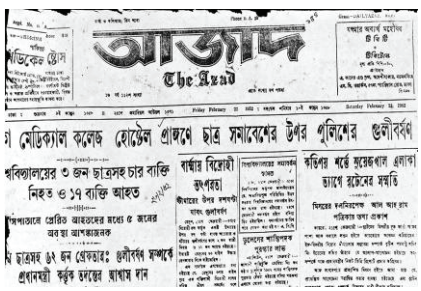
আজাদ
The Azad
মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

চিত্র: ৩

আজাদ
পুলিশের গুলীতে ছাত্র নিহত
নিন্দা

চিত্র: ৪

ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে এবং কয়েকজন শহিদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় *সাপ্তাহিক সৈনিক*'র শহিদ সংখ্যা। লাল কালিতে ও লাল বর্ডার দিয়ে প্রকাশিত এ সংখ্যায় খবরের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ছিল, 'শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত', 'গত বৃহস্পতিবার ৭ জন নিহত, ৩ শতাধিক আহত, ৬২ জন গ্রেফতার', 'শুক্রবারেও ব্যাপক সংখ্যক লোক হতাহত', 'রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা করার শপথ বিঘোষিত'।

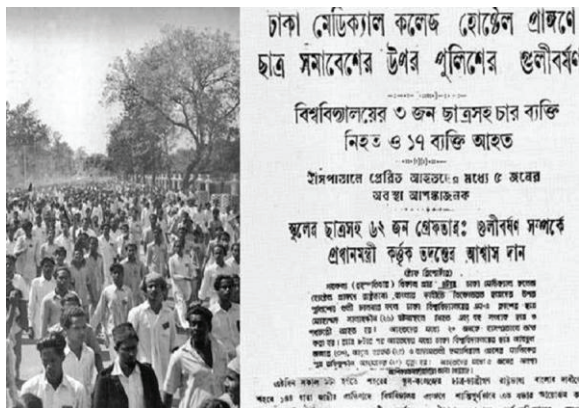

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে
ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি
নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের মধ্যে ৫ জনের
অবস্থা আশঙ্কাজনক

স্কুলের ছাত্রসহ ৬২ জন গ্রেফতার; গুলীবর্ষণ সম্পর্কে
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তের আশ্বাস দান

চিত্র: ৫

ভাষা আন্দোলনের সংবাদ গুরুত্বসহ প্রকাশকারী পত্রিকাগুলোর মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* অন্যতম। কলকাতার *আনন্দবাজার*-এও ভাষা আন্দোলন নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

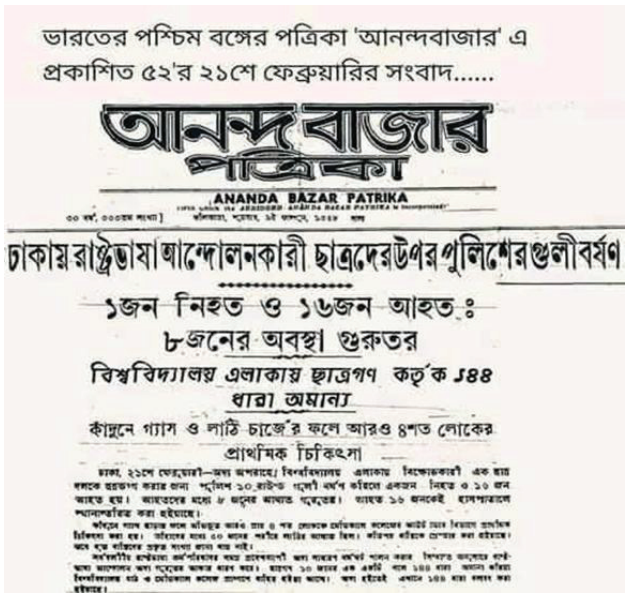

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পত্রিকা 'আনন্দবাজার' এ
প্রকাশিত ৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারির সংবাদ.....

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

১জন নিহত ও ১৬জন আহত ঃ
৮জনের অবস্থা গুরুতর

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রগণ কর্তৃক ১৪৪
ধারা অমান্য

কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জের ফলে আরও ৪শত লোকের
প্রাথমিক চিকিৎসা

চিত্র: ৬

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের খবর কলকতার *যুগান্তর* পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

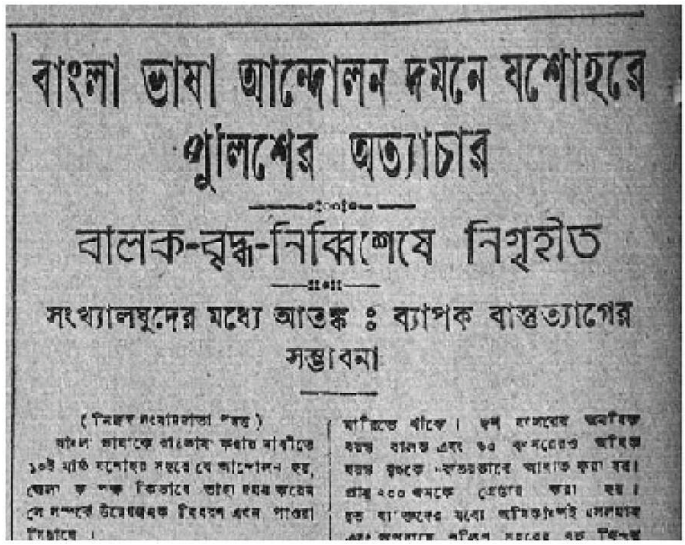

বাংলা ভাষা আন্দোলন দমনে যশোহরে
পুলিশের অত্যাচার

বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে নিগৃহীত

সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক : ব্যাপক বাস্তুত্যাগের
সম্ভাবনা

চিত্র: ৭

কেবল সংবাদ-প্রতিবেদনই নয়, পত্রিকাগুলো ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে নিয়মিত সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ ছাপাতো, যেগুলো ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিকরা তাদের লেখালেখির মাধ্যমে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতেন। এসব প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় পাঠকদের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জাগিয়ে তুলতে সহায়ক ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে *সাপ্তাহিক মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদকীয়'র কথা বলা যায়। ২৭শে জুন, ১৯৪৭ সংখ্যায় 'বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু হতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে, তাহা হইলে সেই উদ্ভট বাসনা বাঙ্গালীর প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।' (জাহান, ২০০৮, পৃ. ৫১)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত *পাক্ষিক তকবীর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে লেখা হয়, 'হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা অবশ্যই বাঙ্গালা হইবে। ইহা জ্যামিতি স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাঙ্গালাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা' (জাহান, ২০০৮)। এছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে লেখক-সাংবাদিকগণ সরাসরিও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন (জাহান, ২০০৮)। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের নাম উঠে আসে, যিনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। আবার ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার দায়ে *অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদক আব্দুস সালামকে কারাগারে প্রেরণ করে তৎকালীন সরকার। আন্দোলনের বিভিন্ন খবর *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত

হতো, যার কারণে পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি *অবজারভার*'র প্রকাশনাই বন্ধ করে দেয় এবং একই সাথে সম্পাদক আবদুস সালাম ও মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে আটক করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের সময়ে সাংবাদিক, কলামিস্ট, লেখক ও সম্পাদকের বড়ো ভূমিকা ছিল। তারা তখনকার সময়ের ঘটনাবলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যমে একদিকে জনগণের মধ্যে চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহকে পত্রিকায় এনে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সংবাদপত্র সেই সময়ে শুধু খবর পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি হয়ে উঠেছিল একটি সামাজিক আন্দোলনের অংশ, যা জনগণের অধিকার, ভাষা, ও সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। সংবাদপত্র তার সামাজিক দায়বদ্ধতার স্থান থেকেই এ দায়িত্ব পালন করে জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।

২) '৫২-পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন

ভাষা আন্দোলনের পর বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল, সেই শহিদদের স্মরণে প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতে থাকে এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের খবর পত্রিকাগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হতে থাকে। শহিদদের স্মরণে সর্বস্তরের মানুষের প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার বিষয়টি সে সময়ের সংবাদপত্রের আলোকচিত্রে দেখা যায়।

চিত্র: ৮

চিত্র: ৯

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের পরের বছরগুলোতে একুশে পালনের ধরন বদলে যেতে থাকে। প্রভাতফেরিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার অধীনে চলে যায়। খবরে দেখা যেত শহিদ মিনারে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য, প্রভাতফেরির মিছিল। তবে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরেও শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকসহ সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিজেদের মতো একুশে পালন করে গেছেন। সদ্যস্বাধীন দেশকে শিল্প ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার আহ্বানও ফুটে উঠতো সেই দিনগুলোর জাতীয় দৈনিকের বিশেষ পাতায়।

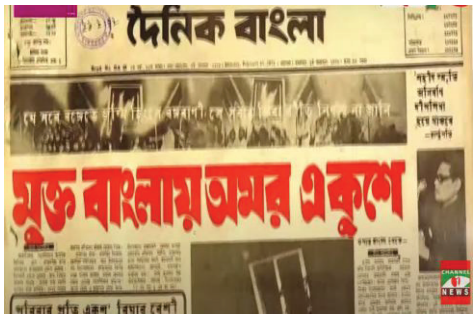

চিত্র: ১০

চিত্র: ১১

পত্রিকাগুলোতে ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিশেষ পাতাও প্রকাশিত হতো। এখানে ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতা, গান, গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্রের আলোচনা স্থান পেত। এর মাধ্যমে পাঠকরা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিকটি সম্পর্কেও জানতে পারতো। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করতো পত্রিকাগুলো; যেখানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, শহিদদের স্মৃতিচারণ এবং নানা ধরনের ফিচার, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ থাকতো। পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে থাকতো বিশ্লেষণধর্মী লেখা, যেখানে সম্পাদক বা বিশিষ্ট লেখকরা আন্দোলনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতেন। এ ধরনের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ফলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, এর চেতনা এবং মাহাত্ম্য নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবাহিত হতো।

চিত্র: ১২

চিত্র: ১৩

৩) সাম্প্রতিক সময়ের সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন

বর্তমান সময়েও পত্রিকাগুলো একইভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংবাদে নিয়ে আসে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শহিদ-বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের একুশ উদ্‌যাপন ইত্যাদি ঘটনার ছবি সংবলিত বিস্তর খবর এবং ফিচারধর্মী লেখা পত্রিকায় পাওয়া যায়।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আজ

প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি

চিত্র: ১৪

'একুশের সাংস্কৃতিক উৎসব'-এর মঞ্চ দিনে নৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। গতকাল রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মূলমঞ্চে। ছবি : কালের কণ্ঠ

চিত্র: ১৫

তবে একই সাথে একুশের চেতনাকে পুঁজি করে পত্রিকাগুলোতে দেশের কর্পোরেট গোষ্ঠীর; বিশেষ করে ফ্যাশন এবং লাইফস্টাইল ব্রান্ডগুলোকে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়। একুশকে ঘিরে পত্রিকাগুলোতে উৎসবের আমেজ তৈরির প্রবণতা লক্ষণীয়। উৎসবের আমেজ তৈরির প্রবণতা প্রকাশ পায় দিবসটিকে ঘিরে বিভিন্ন লাইফস্টাইল পাতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে। একুশের দিন দর্শক কেমন পোশাক পরবে, কেমন খাবার রান্না করবে, কেমন করে চুল বাঁধবে, কোন ধরনের গহনা পরবে, কোন রেস্তোরাঁয় ভোক্তার জন্য কেমন অফার– এসব নিয়ে থাকে বিস্তর প্রতিবেদন। সেই সাথে দেখা যায় বিভিন্ন ফ্যাশন-ব্যান্ডের নাম-লোকেশন তুলে ধরে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন। লাইফস্টাইল সংক্রান্ত এসব প্রতিবেদনে যে প্রবণতাগুলো দেখা যায় সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক দিনকে উপলক্ষ্য করে ফ্যাশন হাউজ এবং অনলাইন শপগুলো নানারকম পোশাক ও গয়নার বিশেষ সংগ্রহ বাজারে এনেছে বলে লাইফস্টাইল সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে। বিশেষ করে অঞ্জন'স, রঙ বাংলাদেশ, মেঘ ইত্যাদি ব্রান্ড একুশের চেতনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ থিমে পোশাক নিয়ে আসে। যেমন, নারীদের একুশের চেতনা প্রকাশ করতে কালো-সাদা শাড়ি, সেলোয়ার-কামিজ, কাঠ, মাটি, সুতা, পুঁতি ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি গয়না, যেখানে বাংলা বর্ণমালা এবং একুশের বিভিন্ন মোটিফ থাকে। সেই সাথে থাকে এই ফ্যাশন হাউজের পোশাক ও গয়না পরা বিভিন্ন মডেলদের নানা অঙ্গভঙ্গির ছবি।

Kaykraft
kaykraft's Ekushey collection are now available in its all outlets. Designers ornamented the dresses using three colors -white, black and light red. They used the motif of Bangla Bornomla (Bengali alphabets) and words in their designs. Primeval alphabets are also used in the designs of their collections. Kay Kraft Bashundhara City outlet manager Nasir Hossian said that special attraction of their fashion house will be family package (4 pieces) for husband, wife and two kids.

Aarong
Apart from a number of dress items, Bangladesh's one of the leading fashion house Aarong has displayed special Slim-Fit Panjabi-Pajama-Coaty-Set for men and kids using mainly white and black. Azmery Akhter, Marketing Officer of Aarong, said a light variation of colors has been chosen to offer shoppers more options this season.

Anjans
Abdul Alim, branch In-charge of Anjan's Bashundhara City outlet, said containing the spirit of the Ekushey, Anjans brings its collection mainly with screen print and block print with the theme of Bornomala (alphabets).
Designers portrayed various sketches with two specific colors-Black and white. In some items, a reddish shade has been used as a reflector.

Rang Bangladesh
Fashion house Rang Bangladesh has used white, black, ash and off-white colors in their Ekushev collections.

Ekushey February now turned into a festival of national achievement and to celebrate the occasion, local boutique shops have been making different outfits for all age groups. Designers have used black-white-red- based traditional motifs and patterns to represent the theme of the International Mother Language Day.

চিত্র: ১৬

লাইফস্টাইল

মার্জিত সাজে কাটুক মাতৃভাষা দিবস

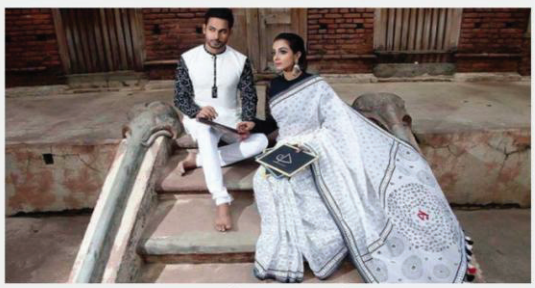

মাতৃভাষা দিবসের সাজ যেমন হওয়া চাই

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আজকের এই স্বাধীন বাংলা। মাতৃভাষা দিবসই বাংলাকে পথ চলার সম্বল করে বাধা পেরোনোর শপথ নেয়ার দিন। দিনটি বাঙালি জাতির জন্য শোক ও গৌরব দুটোই। শুধু বাঙালিরাই নয়, দিবসটি পালন করেন বিশ্বের সব ভাষাভাষী মানুষেরাই। এই দিনে বাঙালিসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সেই শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

মাতৃভাষা দিবসের সাজ-পোশাক

তাইতো মাতৃভাষা দিবসেও চাই সাজের ভিন্নতা। দিনটিতে অবশ্যই পোশাক ও সাজ হতে হবে মার্জিত। বাঙালি নারী-পুরুষ এই দিনে সাদা-কালো রঙের পোশাক বেছে নেন। মূলত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যই সাদা-কালো রঙের পোশাক পরেন বাঙালি নারী-পুরুষরা। যদিও ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্যতম শোকের দিন, তবুও এই মাসেই রয়েছে উদযাপনের নানা রঙিন উপলক্ষ্য। তারপরও এদিনটির সাজ হওয়া চাই একদম মার্জিত। যাতে ভাষা ও ভাষা শহীদের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায় আপনার সাজেই।

চিত্র: ১৭

চিত্র: ১৬ নেওয়া হয়েছে *এশিয়ান নিউজ*'র লাইফস্টাইল পাতা থেকে। এখানে পাঞ্জাবি পরা মডেলের ছবির ক্যাপশনে সরাসরি উল্লেখ করা হচ্ছে 'Ekushey February now turned into a festival of national achievement'। তারা আরো উল্লেখ করছে, এই ফেস্টিভালকে কেন্দ্র করে লোকাল বুটিকশপগুলো কী ধরনের পোশাক নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ পত্রিকাটি সরাসরি একুশে ফেব্রুয়ারিকে উৎসব নামে আখ্যায়িত করে শোককে আনন্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে দিয়েছে এবং সেই উৎসব পালনে কোন কোন বুটিক হাউজের পোশাক এই আনন্দ-উৎসবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বলে দিচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে দেশের স্বনামধন্য বুটিকশপগুলো কী ধরনের পোশাক নিয়ে এসেছে, তার ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ শোক এবং একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে তারা মুনাফার জন্য বাণিজ্যিকীকরণ করছে। বাঙালির গর্ব ভাষা আন্দোলন এবং একুশের স্পিরিট, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয়কে এখানে বিভিন্ন ফ্যাশন এবং পোশাকের ডিজাইনের মাধ্যমে এক ধরনের ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে।

চিত্র: ১৭ নেওয়া হয়েছে *ডেইলি বাংলাদেশ* পত্রিকা থেকে। এখানে বলা হচ্ছে একুশের সাজ কেমন হবে। এখানে 'মার্জিত' সাজের উল্লেখ রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সাদাকালো পোশাক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এক ছবিতে, আর একই প্রতিবেদনের আরেকটি ছবিতে সাদাকালোর সাথে লাল রঙের সমন্বয়ে পোশাকের ডিজাইন উপস্থাপন করা হয়েছে। সাদাকালোর সাথে লাল রঙের সমন্বয়ের কারণ হিসেবে তাদের ভাষ্য: 'যদিও ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্যতম শোকের দিন, তবু এই মাসেই রয়েছে উদ্‌যাপনের নানা রঙিন উপলক্ষ্য।' এটা নিঃসন্দেহে সাদা, কালো এবং লাল রং মেশানো ডিজাইন দিয়ে শোকের একুশসহ ফেব্রুয়ারির অন্যান্য উৎসবকেও কাভার করার একটা মার্কেটিং। ক্রেতার সাশ্রয়ের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বিক্রেতার সারা মাস জুড়ে পোশাক বিক্রয় করতে পারার দিকেও নজর রাখা হয়েছে। ফলে পুরোপুরিভাবে এখানে একুশের চেতনাকে পণ্যে রূপান্তর করা হয়েছে এবং একটা ভোক্তা-সংস্কৃতিকে প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র: ১৮

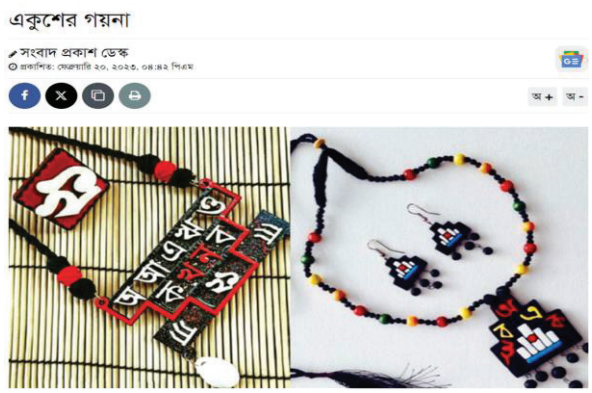

চিত্র: ১৯

চিত্র: ১৮ নেওয়া হয়েছে *জাগো নিউজ* থেকে। এখানেও চিত্র ১৬ এবং চিত্র ১৭-এর মতো একুশের দিন দর্শক কোন ধরনের সাজগোজ করবে, তা নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একুশের দিন মেয়েরা কী

ধরনের লিপস্টিক ব্যবহার করবে, নেইল পালিশের মাধ্যমে কীভাবে বাংলা বর্ণমালার প্যাটার্ন তৈরি করবে, তার ফিরিস্তি আছে। ছেলেদেরকে বলা হচ্ছে, বর্ণমালার ডিজাইন করা পাঞ্জাবি পরতে, মাথায় বাংলাদেশের পতাকা বেঁধে নিতে। এমনভাবে এখানে পোশাক, সাজগোজ, বেশভূষা করতে বলা হয়েছে, যেন একুশ একটা সাজগোজের উপাদান মাত্র। এখানে সরাসরি একুশ, বাংলা বর্ণমালা, দেশের পতাকাকে একেকটা পণ্য হিসেবে ব্যবহার্য উপাদানে পরিণত করা হয়েছে।

চিত্র: ১৯ *সংবাদ প্রকাশ* পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সরাসরি একুশের গহনার প্রচার করা হচ্ছে। বাংলা বর্ণমালা এবং শহিদ মিনারের মোটিফকে সাদা-কালো লাল-নীল রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গলার নেকলেস আর কানের দুলে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতীয় ঐতিহ্যকে প্রকাশ করা হচ্ছে, তেমনি তার বাণিজ্যিকীকরণেরও স্পষ্ট উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে।

চিত্র: ২০

চিত্র: ২০-এর ফিচারটি প্রকাশিত হয়েছিল *সমকাল* পত্রিকায়। প্রকাশের সাথে সাথেই এটা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। বাঙালি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সাজে একজন মডেলকে দেখা যাচ্ছে এখানে, যার পরনে কালো রঙের স্লিভলেস ওয়েস্টার্ন ব্লাউজের সাথে সাদা শাড়ি, মাথায় কালো টুপিতে সাদা ডটের লাইন আর গোলাপি লিপস্টিক ঠোঁটে– তবে তা ঠোঁটের বাইরে গাল পর্যন্ত লেপ্টে আছে। গলায় মাফলার ঝোলানো। মডেলটির পোশাক এবং সাজসজ্জায় সাদা শাড়ি একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতীকী অর্থ বহন করে। কিন্তু অপরদিকে, কালো টুপি ও মাফলার পাশ্চাত্য ফ্যাশনের উপাদান। ঠোঁটের বাইরে গোলাপি রঙের লিপস্টিক পাশ্চাত্য কসমেটিক ও স্টাইলের পপ আর্ট। এই পুরো হাইব্রিড সাজসজ্জা ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়ে সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে ফ্যাশনের অংশ করে বাজারে উপস্থাপন করে। মূলত পশ্চিমা পপ সংস্কৃতির উপাদান এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে একত্র করে এখানে বাজারজাত করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের দিনকে শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন হিসেবে দেখা হলেও এখানে এটি একটি ফ্যাশনেবল ইভেন্ট হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। ছবির চেহারা এবং অঙ্গভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, একুশের দিনটিকে স্টাইল, গ্ল্যামার এবং ফ্যাশনের একটা নতুন প্যাটার্নে রূপান্তর করা

হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক দিনের গভীরতা এবং এর আবেগমূলক মূল্যবোধকে সরিয়ে শহিদদের স্মৃতি এবং তাদের আত্মত্যাগকে কেবল ফ্যাশনে নামিয়ে এনে মূল চেতনার বিকৃতিকরণ করা হয়েছে।

চিত্র: ২১

চিত্র: ২১-এর ফিচারটি প্রকাশিত হয়েছিল *আমাদের সময়* পত্রিকায়। এখানে ভাষা আন্দোলন এবং একুশের স্পিরিটকে খাবারের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়েছে, যাকে 'কমোডিফিকেশন' বলা যায়। এখানে খাবারের ডিজাইনে একুশের মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি পবিত্র ও শোকময় ঐতিহাসিক ঘটনাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উদাহরণ। ফিচারের উপরের বাম কোণে দেখা যাচ্ছে একটি পশ্চিমা স্টাইলের কেক, যার উপর কালো রঙে 'অমর একুশে' লেখা রয়েছে। রক্তের ছাপের মতো সাজানো এবং বর্ণমালার প্রতীকী চিহ্নগুলো কেকের উপরে সাজানো হয়েছে। রক্তাক্ত একুশের মূল প্রতীকগুলোকে এখানে বাণিজ্যিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যান্য খাবারের মধ্যে রয়েছে খিচুড়ি, ইলিশ কোর্মা, এবং সুইস রোল; যেগুলোর ডিজাইনেও একুশের মোটিফ এবং বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষত, খিচুড়ি প্লেটে বর্ণমালার প্রতীকে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক এবং জাতীয় গর্বের উপাদানকে এখানে খাদ্য-পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, একুশের মর্মবাণী বা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেয়ে খাবারের প্যাকেজিং এবং প্রদর্শনীকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলোচনা

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে ঘিরে যে শোক, সংগ্রাম এবং জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ছিল, তা ক্রমশই বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। শুরুতে ভাষা আন্দোলনকে একটা শুভ্র ও পবিত্র শোকগাথা হিসেবে দেখে তার তাৎপর্যকে ধারণ করে এর মহিমা পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছে, পরে সেটা আপামর জনসাধারণ ও রাষ্ট্রীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ একটা উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিবর্তিত হয়েছে এবং সর্বশেষে পত্রিকাগুলোর দ্বারা একুশের বাজারিকরণ প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পরিবর্তে, এ দিনটিকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে একটি ভোক্তা-বাজার। যেখানে পণ্য ও সেবার মাধ্যমে একুশের প্রতীকগুলোকে ব্যবহার করে আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। ফ্যাশন হাউস এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান একুশের চেতনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ পোশাক, সাজসজ্জা এবং লাইফস্টাইল পণ্যের প্রচারণা চালাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় শহিদ মিনার এবং বর্ণমালা সম্পর্কিত আলপনা ও মোটিফগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবহারকে প্রচারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা মূলত পণ্যায়নের প্রতিফলন।

এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্য শুধু ভাষা আন্দোলনের স্মরণে সীমাবদ্ধ না থেকে, সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন এক বাণিজ্যিক রূপ নিচ্ছে। কর্পোরেট মুনাফা নিশ্চিত করতে শহিদদের আত্মত্যাগ এবং বাংলা ভাষার প্রতি যে গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা একদিন ছিল, তা এখন ক্রমেই একটি বিক্রয়যোগ্য ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্যিক পণ্যগুলোতে একুশের চেতনার প্রতিফলন দেখানো হলেও, মূলত তা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে আড়াল করে ভোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

এর ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আর কেবল শোক ও সংগ্রামের দিন হিসেবে নয় বরং একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যা একুশের মূল তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ন করছে। ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সম্মান জানানোর বদলে, এটি একটি ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে শহিদদের স্মৃতির প্রতিফলন পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতীয় ঐতিহ্য এবং ঐক্যের চেতনাকে বাজারের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পত্রিকাগুলোতে ভাষা আন্দোলনের এ ধরনের উপস্থাপনের ফলে গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতার যে কাজ তা পালিত হচ্ছে না। সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে যেভাবে পরিবাহিত হবার কথা, তা হচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের কাছে গৌরবের যে প্রকৃত ইতিহাস আর চেতনা তা পরিবাহিত হচ্ছে না। গণমাধ্যমের সামাজিক উত্তরাধিকার তৈরি করার যে দায়বদ্ধতা তা আর রক্ষিত হচ্ছে না। অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয়গুলো সঠিকভাবে স্থানান্তর হচ্ছে না। প্রায়ই গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্মকে ঐতিহাসিক দিনগুলোতে কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করা হলে তারা সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না। এর দায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-কাঠামোর যেমন, তেমনই গণমাধ্যমেরও।

উপসংহার

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় ঐক্য, শোক ও সংগ্রামের আদর্শ ছিল, তা সময়ের সাথে সাথে বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। শুরুতে ভাষা আন্দোলনকে পবিত্র শোক ও স্মৃতির মর্যাদাপূর্ণ উদ্‌যাপন হিসেবে দেখা হলেও, ক্রমে তা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বিশেষত, পত্রিকা ও গণমাধ্যমের ভূমিকায় এই বাণিজ্যিকীকরণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। শহিদদের আত্মত্যাগ এবং আন্দোলনের মাহাত্ম্য আড়াল করে বাণিজ্যিক পণ্যায়নের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রকৃত চেতনাকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। পত্রিকা ও

গণমাধ্যমের এ ধরনের ভূমিকা পালনের ফলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না এবং গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালিত হচ্ছে না। এর ফলে প্রজন্মান্তরে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে স্থানান্তরিত হবার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

বর্তমান গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখানে সীমিত সংখ্যক নমুনার একটা গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকরা চাইলে গুণগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিস্তর পরিসরে পরিমাণগত বিশ্লেষণ করতে পারেন। এছাড়া, সংবাদপত্রে এ ধরনের উপস্থাপনার প্রভাব জনগণের ওপর কীভাবে পড়ছে, সে বিষয়েও গবেষণা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

আডোর্নো, টি. ও হরখেইমার, এম. (১৯৪৪)। *ডায়ালেকটিক অব এনলাইটেনমেন্ট*। ক্যালিফর্নিয়া: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ভাবা, এইচ. কে. (১৯৯৪)। *দ্য লোকেশন অফ কালচার*। ইংল্যান্ড: রুটলেজ।

জাহান, মো. এমরান (২০০৮)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র (১৯৪৭-১৯৭১)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস।

ডেবর্ড, জি. (১৯৯৫)। *দ্য সোসাইটি অব দ্য স্পেক্টাকল*। নিউ ইয়র্ক: জোন বুকস।

ম্যাককুয়েল, ডি. (২০১০)। *মাস কমিউনিকেশন থিওরি*। মেলবোর্ন: সেজ পাবলিকেশনস।

ল্যাসওয়েল, এইচ. ডি. (১৯৪৮)। 'দ্যা স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশান অব কমিউনিকেশন ইন সোসাইটি'। এল. ব্রাইসন (সম্পা.), *দ্য কমিউনিকেশন অব আইডিয়াস*। নিউ ইয়র্ক: হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স।

শিলার, এইচ. আই. (১৯৮৯)। *কালচার, ইনকর্পোরেটেড: দ্য কর্পোরেট টেকওভার অফ পাবলিক এক্সপ্রেশন*। ইংল্যান্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

সীবার্ট, এফ. এস; পিটারসন, টি. ও শ্রাম, ডব্লিউ. (১৯৫৬)। *ফোর থিওরিজ অফ দ্য প্রেস: দ্য অথরিটারিয়ান, লিবারটেরিয়ান, সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি, অ্যান্ড সোভিয়েত কমিউনিস্ট কনসেপ্টস অফ হোয়াট দ্য প্রেস শুড বি অ্যান্ড ডু*। ইলিনয়: ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় প্রেস।

হাচিন্স, আর. এম. (১৯৪৭)। *আ ফ্রি অ্যান্ড রেসপনসিবল প্রেস: আ জেনারেল রিপোর্ট অন মাস কমিউনিকেশন: নিউজপেপারস, রেডিও, মোশন পিকচারস, ম্যাগাজিনস, অ্যান্ড বুকস*। শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস।

হোসকিন্স, সি. ও ম্যাকফেডেন, ডি. (২০০০)। *মিডিয়া ইকোনমিকস: কনসেপ্টস অ্যান্ড ইস্যুজ*। মেলবোর্ন: সেজ পাবলিকেশনস।

হ্যাবারমাস, জে. (১৯৮৯)। *দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্ফিয়ার: এন ইনকোয়ারি ইনটু অ্যা ক্যাটেগরি অফ বুর্জোয়া সোসাইটি*। ক্যামব্রিজ: এমআইটি প্রেস।

পত্রিকা ও রিপোর্ট

https://www.channelionline.com/1973-74-february-1973-74-press-release/। সাইটে প্রবেশ: ১২ই জুলাই, ২০২৪।

https://www.channelionline.com/in-february-1972/। সাইটে প্রবেশ: ১২ই জুলাই, ২০২৪।

https://dailysangram.info/post। সাইটে প্রবেশ: ২০শে মার্চ, ২০২৪।

'ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্রের সোচ্চার ভূমিকা'। *dailyinqilab.com*। সাইটে প্রবেশ: ১০ই মার্চ, ২০২৪।

'ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা'। *dailysangram.com*। সাইটে প্রবেশ: ১৫ই মার্চ, ২০২৪।

'ভাষা আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা'। *sarabangla.net*। সাইটে প্রবেশ: ১৫ই মার্চ, ২০২৪।

'সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন'। *prothomalo.com*। সাইটে প্রবেশ: ১৫ই মার্চ, ২০২৪।

সাপ্তাহিক মিল্লাত, ১২ই জুন, ১৯৪৭।

পাক্ষিক তকবীর, ১লা জানুয়ারি ১৯৪৮।